গড়তে হলে ঘুরে দাঁড়াতে হবে

অভী দত্ত মজুমদার।

(এককমাত্রা, জুলাই ২০০৮)

রাজা তোর কাপড় খোলা। সবাই বলছেন, কিন্তু রাজা নির্বিকার। নিষ্ঠাবান, লক্ষ্যে অবিচল নীতিবাগিশ আদর্শ পুরুষ। এই মহান পুরুষ কিছু করতে চেয়েছিলেন, রাজ্যের মানুষের হাহাকারে যার ঘুম নেই, লক্ষ লক্ষ বেকারের জ্বালা যিনি সহ্য করতে পারছেন না, যিনি কলকাতাটা কে সোনা দিয়ে আপাদ মস্তক মুড়ে দিতে চান, আবর্জনার মতন বাড়তি এঁটুলে পোকা গুলোকে ঝেটিয়ে বিদেয় করে গড়ে তুলতে চান নতুন একটা শহর। যে শহরে থাকবে শুধু কাজের মানুষ, অকেজোদের স্থান নেই। যে শহরে কোন বেকার রাস্তায় রকবাজি করে সন্ধেটা কাটিয়ে দেবে এমন আর হবে না, যারা কাজ করবে, উন্নয়নের ভাগীদার হবে তাদের জন্যে তিনি তৈরী করে দিচ্ছেন অত্যাধুনিক বাজার, পাব, বার, শপিং মল, আইনক্স, পিৎজা হাট, ডমিনোজ, শপার স্টপ। যারা পারবে না তারা আউট – চুলোয় যাক।

তিনি গড়ে তুলতে চান অত্যধুনিক এয়ারপোর্ট, হেলথ সিটি, নলেজ সিটি, বায়োপার্ক। হয়তো সবার সেখানে স্থান হবে না, অনেকেই ঢুকতে পারবেন না সেই সমস্ত এলাকাতে, কিন্তু তারা পারবেন, যারা যোগ্য, মেধাবী, করিৎকর্মা। তাদের কথা তো ভাবতে হবে ! সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাবার ব্যায়ভার সরকার নেবে না। নেওয়া সম্ভব না, তাই ফেল কড়ি মাখ তেল। সবার জন্যে কিছু করা এখন অসম্ভব, তাই শতকরা কুড়িভাগের কথাই ভাবতে হচ্ছে, এটা বুঝতে হবে।

আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কত যুবক তরুণ তরুণী চলে যাচ্ছিল অন্য রাজ্যে। কেন যাবে ? কেন তারা এখানে থাকতে পারবে না ? তাই ওদের জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি নগরী সেক্টর ফাইভ, গড়ে উঠছে একের পর এক কল সেন্টার, সেখানে কত চাকরী হচ্ছে। এরপর পড়ে আছে গোটা রাজারহাট প্রকল্প, দেখতে দেখতে বাইপাসের ধারে কত গুলো হাসপাতাল তৈরী হয়ে গেল, ঝাঁক ঝাঁক বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেট্রো ক্যাশ এ্যাণ্ড ক্যারি, স্পেন্সার, অনতিদূরেই ছোট গাড়ীর কারখানা, জাহাজ নির্মান কেন্দ্র, এক যোগে এতকিছু কে ভেবেছে আগে বলুন তো ?

তিনি এলাকা ঘিরে ঘিরে বানাতে চান এক একটা বিশেষ অঞ্চল, সেখানে দিন থেকে রাত্তির নিরবচ্ছিন্ন লয়ে চাকাটা অবিরাম ঘুরবে। শুধু কাজ আর কাজ, এর বাইরে কিছু নেই। এটা প্রতিযোগিতার সময়, এগিয়ে যাবার সময়, দৌড় দৌড়, থেমে থাকা চলবে না। এটা এমন একটা সময় যখন পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের একটা পরিবেশ তৈরী হয়েছে, সাহেব, আধাসাহেব, মেমসাহেব সবাই আসছে । ওরা বুঝতে পারছে একটা পরিবর্তনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। অনুভব করছে বাংলার পালে এখন নতুন উদারনৈতিক হাওয়া, যা ওদের স্বাস্থ্য উদ্ধারের এটা একটা মনোরম ভূমি হতে পারে। তাই বহুজাতিক বানিজ্যিক সংস্থাগুলি আর বিরূপ মনভাব পোষণ করছে না, বিশেষত তাদের যে ভাবে জামাই আদরে ডেকে আনা হচ্ছে তাতে এরা বেশ খুশী, যা চাই তাই পাই এর সময় এখন।

দেখুন না টাটাদের কী ভাবে জমিটার দখল দেওয়া হল। বিদ্যুতে ছাড়, জলে ছাড়, পরিবেশে রক্ষার দায়ভার নিয়ে হবে না, এমন সুযোগ কী খুব বেশী আসে ? উলটো দিকেও কিছু দেনা পাওনার মূলধনী হিসেব নিশ্চয় আছে, মোদ্দা কথা দুপক্ষই সমস্ত বৈরীতা কাটিয়ে এখন নতুন সূর্যোদয়ের আশা আকাঙ্খায় ঘর বাঁধছেন। গোটাটাই আসলে একটা চাওয়া পাওয়ার হিসেব, বাকিটা কিন্তু বিজ্ঞাপন। অথচ এ নিয়ে আমরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে চলেছি। কত বির্তক, কত তত্ত্ব। কোনটা উন্নয়ন, কোনটা নয়, কৃষি নাকি শিল্প ? শিল্প তো চাই। কৃষি থেকে শিল্প এটাই তো ইতিহাসের অভিমুখ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উন্নয়ন যারা চান তারা তো প্রথমে একটা উন্নয়ন পরিকল্পনা করবেন, পরিস্কার করে বলবেন তাদের লক্ষ্য কী, কোথায় তারা যেতে চান, কী তারা করতে চান, কেন চান? তা নয়, হঠাৎ প্লেনে যেতে যেতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নাকি জানতে পারলেন টাটারা উত্তরাঞ্চলে একটা মোটর গাড়ি কারখানা স্থাপন করতে আগ্রহী। সংগে সংগে তাঁর প্রস্তাব - ওখানে কেন এখানে এসো। এভাবেই গোটা শিল্পায়নের ভাঁওতাটা চলছে। একে ওকে ধরে আনা। বিনিয়োগকারীদের দাবি মতন সমস্ত সুবিধা করে দেওয়া, আর কিছু চাকরীর খুড়োর কর ঝুলিয়ে তাকে উন্নয়নের নামে চালান করে দেওয়া।

হঠাৎ একটা মোটরগাড়ীর কারখানা করে রাজ্য তথা দেশের কী উপকারটা হবে ? ছোট গাড়ির কারখানা কেন, বড় গাড়ি নয় কেন ? সেখানে টাটাদের সাথে আর কারা আসবে তারা কী তৈরী করবে – টাটার নামে জমি অধিগ্রহন করে কেনই বা

সেখানে মার্কিন সংস্থা রিয়ারসনকে জায়গা দেওয়া হবে, কেনই বা ফিয়াট আসবে এ সমস্ত কোন প্রশ্নই তোলা যাবে না। তোলামাত্র আপনি চিহ্নিত হয়ে যাবেন শিল্প বিরোধী উন্নয়ন বিরোধী হিসেবে।

যখন সিঙ্গুরের বহুফসলি জমি নিয়ে প্রশ্ন উঠলো তখন এক একটা চটকদারী স্লোগানে শাসক দলেন নেতারা বাজার উত্তপ্ত করে তুললো। কৃষি আর এখন লাভজনক নয়, কৃষকের ছেলে কী কৃষকই থাকবে, কৃষি আমাদের ভিত্তি শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। ভাবটা এমন যেন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কৃষককে কালকেই এনে দলে দলে কারখানাতে কাজ দিয়ে দেবে এবং তাদের মজুরী এমন জায়গায় যাবে যে রাতারাতি ওরা শহুরে বড়লোক হয়ে উঠবে, শপিং মল, পাব বারে অবাধ প্রবেশের টিকিট পেয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ সে গল্প বিশ্বাস করে নি। যুক্তির অসারতা বুঝতে তাদের কোন ভুল হয়নি। তারা অভিজ্ঞতা দিয়ে মিলিয়ে নিয়েছে যে জমি হারালে কার লাভ কার ক্ষতি, তারা বুঝেছে যে যতই শিল্প হোক না কেন তার লাভের গুঁড় খাবে আলালের ঘরের দুলালরাই। এর সাথে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা সত্তর ভাগ মানুষের কোন ও যোগই নেই। তাই পুলিশ দিয়ে, ক্যাডার নামিয়ে, বন্দুকের নলে টাটার স্বার্থে জমি অধিগ্রহনের জবাব সিঙ্গুরের মানুষ দিয়েছে। দীর্ঘ লড়াই আন্দোলনে আপাতত পরাজয় হলেও নির্বাচনের রায়ে তারা স্পষ্টতই বুঝিয়ে দিয়েছে এই উন্নয়ন তারা মানছে না। কিন্তু রাজাবাবু তাতে কর্ণপাত করবেন বলে তো কারও মনে হয় না। তবে সরকার সিঙ্গুরে কোন রকমে এলাকাতা ঘিরে নিলেও ধাক্কা খেয়েছে নন্দীগ্রামে। হয়তো সিঙ্গুর থেকেই শিক্ষা নিয়েছিল নন্দীগ্রামের মানুষ, সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা প্রতিরোধ আন্দোলনটাকে আরও তীব্র মাত্রা নিয়ে যেতে পেরেছিল। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে ঘোষণা করতে হয়েছিল, না নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব নয়।

নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব প্রকল্প আটকে গেছে, কিন্ত শাসকদলের বেপরোয়া মনোভাব কিন্ত কাটেনি। তাই তারা দীর্ঘদিন ধরে এলাকা দখলের লড়াই চালিয়ে গেছে। নন্দীগ্রামে মাসের পর মাস যা চলেছে বা বাইরে থেকে নির্বাচনে হারের পর আপাত কিছুটা স্তিমিত হলেও তা অঘোষিত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের আসল খেলোয়ারদের আমরা দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে এই প্রকল্পে যুক্ত আন্তর্জাতিক বাঘা বাঘা বহুজাতিক সংস্থাগুলি, যারা নিজেরাই এখন তৃতীয় বিশ্বে জায়গা পেতে মরিয়া। এদের এক একজনের ইতিহাস আমরা জানি। যেমন শোনা যাচ্ছে এই কেমিক্যাল হাবে বিনিয়োগে আগ্রহী মার্কিন সংস্থা ডাউ কেমিক্যাল, ভিয়েতনাম যুদ্ধে তাদের ভূমিকা আজ আর কারও অজানা নয়, আমরা জানি কীভাবে দিনের পর দিন নাপাম বোমার আঘাতে গোটা ভিয়েতনামকে ওরা বিদির্ণ করেছিল, জানি আজকে যুদ্ধের ত্রিশ বছর পরেও কী ভাবে মানুষ সেই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে বিকলাঙ্গ শিশু, জানি আকাশ থেকে এজেন্ট অরেঞ্জ ছড়িয়ে কীভাবে সমস্ত বনাঞ্চল কে ওরা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

ভিয়েতনাম কেন কী করছে ওরা ভূপালে ? ১৯৮৪ সালে সেই ভয়াবহ মিক দুর্ঘটনার কথা ভাবলে এখনো শিউরে উঠি আমরা। সেদিন রাতেই আট হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল এই দূর্ঘটনার ফলে, খুব রক্ষনশীল হিসেবেও অন্তত আজ পর্যন্ত বাইশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং পঞ্চাশ হাজারেও বেশী মানুষ ঘটনার চব্বিশ বছর পরেও সেই ফল ভোগ করে চলেছেন। সেখানে তখন ডাউ ছিল না, ছিল ইউনিয়ান কার্বাইড। কিন্তু ২০০১ সালে ডাউ সেই ইউনিয়ান কার্বাইডকে অধিগ্রহণ করে নেয়, কিন্তু তারা এখনো সেই দুর্ঘটনার দায়ভার নিতে অস্বীকার করছে। যখন এলাকার পানীয় জল দূষিত, মাটি বিষাক্ত, এলাকায় এখন জন্ম নিচ্ছে বিকলাঙ্গ শিশু তখন, ক্ষতিপূরণ দেওয়া দুরস্ত, এমন কী সেই এলাকা পরিস্কার করায় দায় দায়িত্ব মুক্ত হতে চাইছে ডাউ কেমিক্যাল, আর তার হয়ে ওকালতি করে যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়াকে চিঠি লিখছে রতন টাটা। এদেরকেই আবার পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের জন্যে ডেকে আনতে চাইছে রাজ্যের বামপন্থী সরকার।

শুধু ডাউ নয়, আরও নানা বহুজাতিক সংস্থার কথাই শোনা যাচ্ছে যারা প্রস্তাবিত হাবে বিনিয়োগে আগ্রহী। কেননা আজকে প্রথম বিশ্বে রাসায়নিক কারখানা গুলি তীব্র সংকটের মুখোমুখী, এর মূল কারণ দুটি এক নতুন পরিবেশ বিধি, বিশেষত রাসায়নিক শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়ত বহুজাতিক পেট্রোকেমিক্যাল সংস্থাগুলি নিজেদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে যতটা সম্ভব তৈল উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি নিয়ে আস্তে চাইছে। এরপর আছে সস্তা শ্রম, বিদ্যুৎ, জল, জমি ইত্যাদি। মোদ্দা কথা হল বিনিয়োগ তার নিজের তাগিদেই আসছে, অর্থাৎ এটা তাদেরই উন্নয়ন পরিকল্পনা, আমাদের নয়। এভাবেই আসলে ঐতিহাসিক ভাবেই ভারতবর্ষের মতন দেশগুলির রাজনীতি অর্থনীতি মূলত প্রথম বিশ্বের নিজস্ব চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে বিনিয়োগ মূলত আসছে পরিষেবায়, আসছে এই ধরণের শিল্পে যেখানে পরিবেশ একটা বড় ফ্যাক্টর, যাদেরকে বলা হয় ডার্টি ইন্ডাস্ট্রিস, আর আসছে শ্রমনিবির শিল্প যেমন জামা কাপড়, জুতোর কারখানা আর আসছে কৃষি, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে যার সাথে রাসায়নিক শিল্পের যোগযোগ খুব নিবিড়। এবারে প্রশ্ন হল এ ধরণের শিল্পায়ন কে আমরা সমর্থন করব কী না ? এ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার স্বার্থে, এখানে আমাদের সরকারের ভূমিকাটাই বা কী ?

যদি সত্যি এই প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হয় তাহলে বর্তমান প্রক্রিয়াটাকে দেখতে হবে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, বারে বারে শাসকদল নানা কথার জালে বিষয়টাকে ঘেটে দিতে চাইছে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব একটা ইতিহাসিক ঘটনা, যে ঘটনার

মানুষের সভ্যতার জানা ইতিহাসের একটা অভূতপূর্ব অধ্যায়। যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল একটা নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা গোটা পৃথিবীটাকে পর্যায়ক্রমে নিজের সাথে জুড়ে নিয়েছিল। ইউরোপকে কেন্দ্রে রেখে শিল্প বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে নিজেকে ক্ষমতার কেন্দ্রে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। এর পিছনে ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভুতপূর্ব অগ্রগতি। বাস্পচালিত ইঞ্জিন, বিদ্যুৎএর আবিস্কার, টেলিগ্রাফ, রেলপথ স্থাপন এর এক একটা উল্লম্ফন। যার ফলে ইউরোপ প্রচুর পরিমান পন্য উৎপাদনে সমর্থ হয়। যার হাত ধরে গড়ে উঠতে থাকে একটার পর একটা বানিজ্যিক সংস্থা, ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ডাচ ওয়েষ্ট ইন্ডিজ কোম্পানী, যাদেরকেই বহুজাতিক সংস্থার প্রথম বীজ বলে মনে করা যায়। এরা দেশে দেশে বানিজ্য করতে বেরিয়ে পড়ে, বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে, উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে দিয়ে নিজেদের সাথে যুক্ত করে নেয়। সেই অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রত্যক্ষ ফসলই বর্তমান বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থা যেখানেই তার শিকড় বিস্তার করেছে সেখানেই স্বাধীন বিকাশের পথ কে রুদ্ধ করেছে। সেই স্বাধীন দেশগুলির নিজস্ব শিল্প এবং কৃষি সব কিছুই সে ধ্বংস করেছে। যেমন ওরা ভারতবর্ষের সেই সময়ের সমৃদ্ধ তাঁত শিল্পকে গিলে খেয়েছে, তার কৃষিজমি গুলিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। উপনিবেশগুলির উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিজেরা নিজেদের প্রয়োজনে পছন্দ মতন সাজিয়ে নিয়েছে। জমি জঙ্গল খনিজ পদার্থ লুন্ঠন করেছে শুধু নয়, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান দিতে বাধ্য করেছে উপনিবেশগুলিকে। ভারতকে বাধ্য করেছে পাট চাষ করতে, নীল চাষ করতে, ইজিপ্টকে বাধ্য করেছে তুলোর যোগান দিতে, ব্রাজিল থেকে নিয়ে এসেছে কফি। এ ভাবেই সমস্ত পৃথিবীর উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিজের মতন করে নিয়ন্ত্রিত করে সম্পদ জড়ো করেছে নিজেদের দেশে, নিজেরা সমৃদ্ধ হয়েছে, বড়লোক হয়েছে, আর উপনিবেশগুলি শুকিয়ে মরেছে, সমস্ত দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে। যাদের পশ্চাৎপদতা কাটেনি, নিজস্ব বিজ্ঞান, প্রযুক্তির কোন বিকাশ ঘটেনি, অশিক্ষা অন্ধকার যাদের ঘিরে রেখেছে। যাদের কৃষি সমাজ মুলত কৃষি সমাজ- ই থেকে গেছে। যে সমাজ মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের শিকড় ছিঁড়ে বেরোতে পারেনি সেই সমাজের উন্নতি দূর অস্ত বরং সেখানে চলেছে একটা উন্নয়নের বিপরীতমুখি প্রক্রিয়া, যা চিহ্নিত অবউন্নয়নের প্রক্রিয়া হিসেবে। সেখানে বাড়ছে ক্ষুধা, দারিদ্র অর্ধাহার অনাহার। এটা বাস্তব, এটাই তৃতীয় বিশ্বের ইতিহাস। বিদেশী পুঁজি এটাকেই নিশ্চিত করে।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গেছে। প্রত্যক্ষ ইংরেজ শাসনও গেছে, এর মধ্যে পৃথিবী বদলেছে অনেক। তবে বাহ্যত যতই খোলস বদলাক না কেন, ইতিহাসের ধারা কিন্তু বদলায় নি। দু দুটো বিশ্ব যুদ্ধ, দেশে দেশে বিউপনিবেশায়ন হয়েছে বটে কিন্তু এসেছে আগ্রাসনের নতুন নতুন অস্ত্র – মুক্ত বাণিজ্যে অর্থনীতি, নয়া উদারনীতিবাদ, বিশ্বায়নের কর্মসূচী। বিশ্বে উৎপাদন বাড়ছে কিন্তু সেই সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য, তৃতীয় বিশ্বের অন্তত পঞ্চাশটা দেশের জাতীয় আয় কমেছে, দারিদ্র বেড়েছে। ইতিহাসের চাকা যেদিকে ঘুরছিল সেদিকেই ঘুরছে। সমস্ত দেশের সম্পদ গিয়ে জড়ো হচ্ছে গুটিকতক দেশে, কৃষি থেকে শিল্প গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাটাকেই নিজেদের কব্জায় নিয়ে এসেছে হাতে গোনা কয়েকটী বানিজ্যিক সুংস্থা। গ্রহটাকেও আড়াআড়ি দুভাগে ভাগ করে নিয়েছে ওরা। উত্তর আর দক্ষিণ, উত্তরে আছে বিশ্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় দেশগুলি, যে সমস্ত দেশে স্বাধীন পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল, যারা অন্য গোলার্ধে নিজেদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, আর দক্ষিণে আছে প্রান্তীয় দেশ সমূহ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার দেশগুলি। এই প্রান্তীয় দেশগুলির অর্থনীতি আসলে নির্ভরতার অর্থনীতি, এই প্রান্তীয় দেশগুলির রাজনীতিও তাই কেন্দ্রীয় দেশগুলির স্বার্থ দিয়েই পরিচালিত।

ঠিক যেমন গ্রাম কে নিংড়ে বেঁচে থাকে শহর, ঠিক সেই ভাবেই এই প্রান্তীয় দেশগুলির সবচাইতে উৎকৃষ্ট রক্ত শুষে নিয়ে মোটা হচ্ছে প্রথম বিশ্ব। এখন নতুন করে মুক্ত বানিজ্যের কথা শুনছি আমরা, বিশ্ব বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে উন্নয়ন এটাই এখন তৃতীয় বিশ্বের বিকাশের নতুন ধারণা। যদি তাই হয় এই বাণিজ্যের মূল অংশীদার কারা ? হিসেবটা একটু নিয়ে নেওয়া যাক। ধরা যাক পৃথিবীর প্রথম পাঁচশটি বহুজাতিক সংস্থার কথা। একটি সাম্প্রতিক তথ্য বলছে এর ভিতর ২৪৪টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ১৭৩ টি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ান অন্তর্ভুক্ত দেশের, ৪৬ টি জাপানের। আর বাকি ৩৭টা হল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের। আর যদি বিশ্বের সবচাইতে বড় ২৫টা সংস্থার কথা ধরা যায় তাহলে আরও স্পষ্ট হবে বিশ্ব অর্থনীতিতে এই কেন্দ্রীয় দেশগুলির আধিপত্য কতখানি। এই হিসেব অনুযায়ী ৭০ শতাংশ মার্কিন, ২৬ শতাংশ ইউরোপীয়, আর মাত্র ৪ শতাংশ জাপানের। বাকিরা কোথায় ? ১৯৯২ সালের একটা হিসেব বলছে পৃথিবীর মোট ৪০,০০০ টি বহুজাতিক সংস্থার মধ্য ২৯,০০০ টির মূল ঘাটি ধনী এগারোটা দেশে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আসলে একটা বিশ্ব ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মূল কথা হল তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থাটাকে নিজের মতন করে সাজিয়ে নেওয়া। কৃষি থেকে শুরু করে শিল্প, পরিষেবা সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে দখল করা। স্থানীয় সম্পদের উপর অধিকার কায়েম করা, এতে সহায়ক হচ্ছে নয়া উদারনীতিবাদ – এক কথায় যার মানে সার্বিক বেসরকারীকরণ। সমস্ত সম্পদ ব্যক্তিমালিকানার অধিনে নিয়ে আসা, খনিজ সম্পদ, জল, জঙ্গল, জমি সমস্ত কিছুর উপর বিনিয়োগকারীদের একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করা। এখান থেকে উৎপন্ন করে পণ্যগুলিকে ওরা নিয়ে যাবে। সব সময় শিল্প পণ্য নেবে তা নয়, আজকে ওরা

উন্নয়নের নামে মুষ্টিমেয় ধনী কৃষকের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে এখান থেকে অর্থকরী ফসল ফলিয়ে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে চাইছে, যেমন শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিকে খালি করে ফুল ফল চাষ করিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে প্রথম বিশ্বে যেখানে মুনাফার ভাগ অনেক বেশী। চুক্তিচাষ, কর্পোরেট কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করছে আর খাদ্য শস্যের জন্যে আমাদের আমদানী নির্ভর করে তুলছে। এর দুটো কারণ খাদ্য শস্য চাষ আজকে আর শ্রমনির্ভর নয়, কিন্তু অর্থকরী ফসল ভীষণ রকমের শ্রম নির্ভর। আরেকটা কারণ হল ওদের জলবায়ু যা সিংহভাগ অর্থকরী ফসল চাষের জন্যে সহায়ক নয় তাই আমাদের উপর ওদের এত নির্ভরতা।

প্রথম বিশ্বে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যবস্থাটা এতোটাই উচ্চপ্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে যে প্রথম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বে মাথাপিছু উৎপাদনের অনুপাত ১৯৪০ সালে যেখানে ছিল ১:১০ , এখন সেটা দাঁড়িয়েছে ১:২০০০। তাই প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য ফলিয়ে ওরা বিশ্ব বাজার দখল করছে। ভুর্তুকি দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে দামটাকে এমন জায়গায় রাখছে যাতে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় বিশ্ব হেরে যায়। শুধু তাই নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ওরা তেমন ভাবে প্রভাবিত করে। যেমন কয়েক বছর আগেও গম উৎপাদনে আমরা স্বনির্ভর ছিলাম এখন আমরা গম আমদানী করছি, তেল নামমাত্র আমদানী হত এখন শতকরা পঞ্চাশভাগ তেল আমরা আমদানী করছি। এই ভাবে খাদ্য আমাদের পরনির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। আর বলা হচ্ছে কৃষি আর লাভজনক নয়।

তুলো, টমেটো, ফল, ফুলের চাষে প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন। তাই প্রান্তীয় দেশগুলিতে শ্রমনির্ভর কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ আসছে। এ ছাড়া ভারতবর্ষের মতন দেশে যে ফসল বৈচিত্র আছে, তা ওদের নেই। ভারতবর্ষ সবজি এবং ফল উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম। খাদ্য শস্য বাদ দিলে চীন আর ভারত একদম প্রথম সারীতে। বিশ্বের শতকরা ৪১ ভাগ আম, ৩৬ ভাগ মটরশুঁটি, ১৬ ভাগ দুধ, ২৪ ভাগ কাজুবাদাম, ২৩ ভাগ কলা, ১০ ভাগ পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় এখানে। পৃথিবীর আবাদযোগ্য জমির এগারো ভাগ আছে ভারতে। মাংসের মূল যোগানদার হিসেবে আমরা পৃথিবীর এক নম্বর হতে পারি। তাই ওদের নজর পড়েছে। দেশের শ্রেণীর ধনিক কৃষক কে সঙ্গে নিয়ে, রিলায়েন্স, টাটা, আইটিসি, ভারতী, মাহিন্দ্রা মাহিন্দ্রার মতন সংস্থাগুলি কৃষি বাণিজ্যে বিনিয়োগ করতে উঠেপড়ে লেগেছে, ওরা ওয়ালমার্ট, স্পেন্সার, ক্যফুর মতন বহুজাতিক সংস্থাগুলির সাথে চুক্তি করছে। তাই উর্বর কৃষিজমিতে শুধু শিল্প নয় বললে হবে না, কারণ শুধুমাত্র শিল্পের জন্যে জমি লুন্ঠন হচ্ছে তা নয়, কৃষিজমিতে কৃষি করার জন্যেও বিদেশি বিনিয়োগ আসছে, ওরা কৃষিজমিতে কৃষিই করবে কিন্ত তা হবে নীল চাষের মতন রপ্তানীযোগ্য ফসল উৎপাদন।

কেন্দ্রীয় দেশগুলি ভোগ করবে আর তার যোগান দেব আমরা। ওদের সমাজ হবে উন্নত থেকে উন্নততর হবে আর আমরা শুধুমাত্র ওদের জন্য উৎপাদন করে যাব। রপ্তানী নির্ভর অর্থনীতি বলে আপেক্ষিত সুবিধার কথা, বিশ্বায়নের বিশ্ব বাণিজ্যের মূল কথাটাই তাই। কাজেই এই নীতি কার্যকর করলে কৃষিতে যারা সমৃদ্ধ তারা কৃষিতেই থাকবে আর যারা শিল্প প্রযুক্তি বিজ্ঞানে এগিয়ে আছে তারা শিল্প পন্যের ব্যবসা করবে। কাজেই বিশ্বায়নের কর্মসূচীকে আঁকড়ে যারা উন্নয়নের গল্প সাজিয়ে আমাদের সামনে হাজির করছে, কৃষি বনাম শিল্পর বিতর্ক তুলছেন তারা কার্যত শিল্প বিরোধী। নিজ প্রযুক্তির বিকাশ না হলে শিল্প হয় না। অন্যের থেকে প্রযুক্তি ধার করে যদি শিল্প গড়ে তোলা যেত তাহলে তৃতীয় বিশ্ব কখনই এভাবে নিস্ব হয়ে যেত না।

বিশ্ব বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশে বিনিয়োগ করতে আসছে মূলত চারটি কারণে, এক কম মজুরি দিয়ে এবং পরিবেশ ও শ্রম সংক্রান্ত বিধি শিথিল করে (বা না মেনে) সস্তায় পণ্য উৎপন্ন করা, দুই সম্পদ লুন্ঠন, তিন আভ্যন্তরীণ বাজারটা যথা সম্ভব ধরা। তৃতীয় বিশ্বের বিনিয়োগএর ধরণ দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। শ্রমনিবিড় শিল্প ছাড়া বিনিয়োগ আসছে পরিষেবাতে, স্বাস্থ্যে। আসছে কৃষিতে, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণে, বস্ত্র উৎপাদন। বিষয়টা হবে এমন মনসান্টোর তৈরী জৈবপ্রযুক্তিজাত বীজ নিয়ে, স্থানীয় সংস্থা মাহাইকোর সহায়তাইয় বিদেশী সংস্থার ঋণ নিয়ে ওদের কীটনাশক আগাছানাশক সার সহ সমস্ত উৎপাদনের উপাদান কিনে এদেশের বৃহৎ বানিজ্যিক সংস্থাগুলি স্থানীয় জমিগুলির দখল নিয়ে তূলো উৎপন্ন করবে, সেই তুলো ব্যবহার করে ওদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে বস্ত্র তৈরী হবে, তার কিছুটা স্থানীয় বাজারে বিক্রি হবে, বাকিটা চলে যাবে প্রথম বিশ্বে, কিনে নেবে ক্যফু, ওয়ালমার্ট, টেসকোর মতন খুচরো ব্যবসার একচেটিয়া কারবারীরা যারা মুনাফার সিংহ ভাগে থাবা বসাবে। সবচাইতে সস্তার জুতো তৈরী করবো আমরা, সবচাইতে সস্তায় জামাকাপড় তৈরী করে দেবে আমাদের দারিদ্র সীমার প্রান্তে বসে থাকা অল্প বয়সের মেয়েরা, যারা ঘাড় গুঁজে ঘন্টার পর ঘন্টা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজ করে যাবে, ছোট ছোট চিকন হাতে বুনে যাবে শৈখিন পোষাক, সোনার গহনা, আর সবচাইতে দামী গাড়িটা নিয়ে আসব ওদের থেকে, চাষাবাদের যন্ত্র নিয়ে আমদানী করব, নিজেদের সমস্ত বাজার তুলে দেব ওদের হাতে। বলবো বিনিয়োগ আসছে, ওদেরকে একটা জায়গা করে দিতে হবে। এতে করে শ্রমিক শ্রমিক থাকবে, স্বনির্ভর কৃষি ক্ষেত্র থেকে অধিকাংশ কৃষক বিতারিত হবে, আর বাকিরা চুক্তিবদ্ধ কৃষি শ্রমিকে পরিণত হবে।

বিশ্ব ব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তন কিন্তু কিছু হয় নি, বরং আধুনিক প্রযুক্তির কল্যানে তা এখন অনেক বেশী আগ্রাসী এবং শক্তিশালী। মনে রাখতে হবে ব্যবস্থাটাও এখন অনেক বেশী পরিণত, তাই এখন আর বাইরে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে শাসন ব্যবস্থার দখল নিয়ে স্থানীয় ভাবে আইন করে এক একটা দেশে এক এক রকম নিয়ম নীতি করে তাকে চলতে হয় না। সে এমন একটা ব্যবস্থা তৈরী করতে পারে যেখানে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রন না রেখেও তৃতীয় বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্পকে পরিচালনা করতে পারে। তার সাথে এখন আছে আই এম এফ, বিশ্বব্যাংক বিশ্ব বানিজ্যিক সংস্থাগুলি। আছে নানাবিধ পেটেন্ট আইন। তাই এদের ছত্রছায়ায় গৃহীত শিল্পনীতি থেকে কেউ যদি মনে করে ভারতবর্ষে নতুন করে শিল্প বিপ্লব হতে চলেছে তাহলে নিশ্চিত ভাবেই মুর্খ্যের স্বর্গে বাস করছেন। তাই পশ্চিমবঙ্গের নতুন শিল্প স্থাপন এবং ব্যপক কৃষিজমি অধিগ্রহনকে সম্প্রসারণশীল বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারাবাহিকতার আলোকেই দেখতে হবে, আর সেই বিচারে পরিস্কার হয়ে যাবে যে বামপন্থীরা মুখে যাই বলুক না কেন তারাই এখন বিশ্বায়নের কর্মসূচী রূপায়নের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছে এবং একটা সামগ্রিক লুন্ঠন পরিকল্পনাকে উন্নয়নের লেবেল সেঁটে মানুষের সামনে হাজির করছে।

ভাবুন না এ রাজ্যে প্রস্তাবিত কেমিক্যাল হাবের কথাই। কী উন্নয়ন হবে তাতে ? কাদের কাজে লাগবে এটা যার জন্যে এই হাব স্থাপনে মুখ্যমন্ত্রীর এত তৎপরতা। এই শিল্পের কাঁচামাল আমাদের নেই, প্রযুক্তি আমাদের নেই, এমন কী উৎপাদিত পণ্যের বাজারও এ দেশে তেমন নেই, তবু কেন একচেটিয়া বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির এখানে বিনিয়োগে এত আগ্রহ ? নিজেদের দেশে তারা খেয়ে ওরা এখানে আসছে আমাদের জমিগুলোকে ধ্বংস করবে বলে, আমাদের জলাভূমিগুলিকে বিষাক্ত করবে বলে। এক একটা এলাকা ঘিরে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে এদেরকে জায়গা করে দিচ্ছে আমাদের সরকার। যে এলাকার জন্যে আলাদা আইন করে দেওয়া হচ্ছে। সারা দেশের পরিবেশ বিধি ওখানে প্রযোজ্য নয়। এখানে এরা কাঁচামাল নিয়ে আসবে, পণ্য উৎপাদন করবে, তারপর জাহাজে করে উৎপাদিত পণ্য নিজেরা নিয়ে চলে যাবে যেখানে তার মূল বাজার।

হলদিয়া প্রকল্প ব্যর্থ হল কেন ? বিধান সভায় পেশ করা সরকারের স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট বলছে হলদিয়াতে তেমন কর্মসংস্থান হয়নি তার কারণ ওখানে অনুসারী শিল্প তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। আর তা না গড়ে ওঠার ব্যখ্যা দিতে গিয়ে সেই নথিই বলছে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রতি পরিমার ব্যবহারের পরিমাণ মাত্র তিন কেজি তাই হলদিয়াকে কেন্দ্র করে তেমন অনুসারী শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি। দেড় লক্ষ মানুষের কাজ পাওয়াও তাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এই অবস্থাটার কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় নি। অর্থাৎ দেশে হঠাৎ পেট্রোরাসায়নিক পণ্যের চাহিদা ভীষণ বেড়ে গেছে এমনটা নয়। তাও কেন এই হাব ? এর কারণ শুধুমাত্র সস্তা শ্রম আর শিথিল পরিবেশ বিধির সুযোগ নিয়ে বাড়তি মুনাফার পথ প্রশস্ত করা যেখানে আমাদের কাজ হবে শুধুই ওদের চাহিদা মেটানো। মানে আমরা উৎপন্ন করে যাবো আর ভোগ করে যাবে ওরা।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যদি পরিমার ব্যবহারের একটা তুলনা মূলক বিচার করা যায় তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে পলিমার ব্যবহারে সবচাইতে এগিয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মাথাপিছু বছরে ওরা ব্যবহার করে ৪১ কেজি, চীন করে ৭ কেজি আর ভারতের গড় ২ কেজি। বছরে জনপ্রতি বিশ্বগড় ১৬ কেজি কিন্তু শুধুমাত্র এশিয়া ধরলে এটা দাঁড়ায় ৯ কেজি। অন্যদিকে ধরাযাক বাজারের একটা হিসেব। যেমন স্পেসালিটি কেমিক্যালএর বাজার উত্তর আমেরিকায় ২২ শতাংশ, পশ্চিম ইউরোপে ৪৩ শতাংশ, সমগ্র এশিয়াতে ২৬ শতাংশ আর বাকি সমস্ত দেশে ৪ শতাংশ। স্পষ্টতই পেট্রোকেমিক্যালের মূল ভোক্তা কেন্দ্রীয় দেশগুলি। এখানে ভারতের মতন দেশের কাজ শুধু যোগান দিয়ে যাওয়া। শ্রম দিয়ে, কাঁচামাল দিয়ে, কৃষিপন্য দিয়ে সাথে সাথে কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই ভিতরের সীমিত বাজারটাকেও ওদের ছেড়ে দিতে হবে। এটা লুন্ঠন পরিকল্পনা ছাড়া আর কী ?

প্রশ্ন তাহলে উঠে আসে তাহলে কীভাবে হবে আমাদের বিকাশ, কোন পথে ? পথটা খুব অস্পষ্ট নয়। তবে সংগ্রামটা কঠিন। প্রথম কাজটাই হবে এখন মূখোসটাকে ছিঁড়ে মুখটাকে বাইরে আনা। লুন্ঠনকে প্রতিহত করা যে লুন্ঠন সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাটাকে কেন্দ্রীয় দেশের স্বার্থে ব্যবহার করছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, দেশীয় সম্পদ রক্ষা করা, কেন্দ্রীয় দেশের প্রয়োজনে গৃহীত অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বিপরীতে দেশীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গড়ে তুলে আশি শতাংশ মানুষের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহন করা এই সময়ের দাবি। আমূল ভূমিসংস্কারের মধ্যদিয়ে কৃষিজীবি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে সচেষ্ট হওয়া। যদি তা হয় তাহলে সেখান থেকে বিকশিত হতে পারে আভ্যন্তরীন বাজার, তৈরী হতে পারে ক্ষুদ্র শিল্পতালুক, যেখান থেকে ভারী শিল্প বিকাশের পথও প্রশস্ত হতে পারে। ঘুরে কিন্তু দাঁড়াতেই হবে। যারা আজকে বলছেন পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটাতে হবে তারা কিন্তু এই স্বাধীন পুঁজিবাদের বিকাশের কথা বলছেন না, তারা বিশ্বপুঁজির কথা বলছেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপুঁজি কোন দেশেই কিন্তু বিকাশ ঘটাতে পারে নি, তারা পুরোনো ব্যবস্থাটাকেই নিজেদের মতন করে সাজিয়ে নেয়। তাই শপিং মল সেনেপ্লেক্স মাল্টিপ্লেক্সের পাশে জমি হারা উচ্ছেদ হওয়া হাজার হাজার মুখ ভেসে ওঠে। বৈভবের পাশেই উঁকি মারে পাংশুটে হতদরিদ্র আধাছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা কৃশ শরীর। পশ্চাদপদ সমাজ পশ্চাদপদই থাকে, কৃষি সমাজ কোনদিনই শিল্প সমাজে উন্নীত হতে পারে না। এটাকেই রাজা মশাই গুলিয়ে দিতে চাইছেন। তাই এখন ঘুরে দাঁড়াতেই হবে।

তথ্যসূত্র ১। গ্লোবালাইজেশন আনমাস্কড, জেমস পেট্রাস এবং হেনরী ভেল্টমেয়ার ২। দ্যি লিবারাল ভাইরাস, সামির আমিন ৩। গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ট ইটস ডিসকনটেন্ড, যোসেফ স্টিগলিজ ৪। বিশ্বায়ন শিল্পায়ন কেমিক্যাল হাব, প্লাটফর্ম ।